একক ৪৪ ☐ নিয়মের রাজস্ব — রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

গঠন

৪৪.১ উদ্দেশ্য
৪৪.২ প্রস্তাবনা
৪৪.৩ রামেন্দ্রসুন্দর ঃ জীবনকথা
৪৪.৪ রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধ সাহিত্য
৪৪.৫ মূলপাঠ (প্রথম অংশ)
৪৪.৬ সারাংশ
৪৪.৭ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ
৪৪.৮ অনুশীলনী - ১
৪৪.৯ মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ)
৪৪.১০ সারাংশ
৪৪.১১ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ
৪৪.১২ অনুশীলনী - ২
৪৪.১১ গ্রন্থপঞ্জি

৪৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রবন্ধ রচনা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

- তাঁর গদ্যরীতির বিশেষত্বগুলি অনুধাবন করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার বিষয়ে জানতে পারবেন।

৪৪.২ প্রস্তাবনা

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির জীবনে যে রেনেসাঁস দেখা দেয়, তার ফল রূপে রস-সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা শাখায় বাঙালি আপনাকে বিস্তৃত করতে আগ্রহী-উৎসাহী হয়। নানা সাময়িক পত্রে এবং গ্রন্থাদিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র দিক নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ—কেউই এ বিষয়ে গ্রন্থ-প্রবন্ধাদি না লিখে পারেননি। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সেই সব লেখকের অন্যতম। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র এবং শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা অপেক্ষা বিজ্ঞানের বাংলা পরিভাষা নির্মাণে অধিকতর উদ্যোগী ছিলেন এবং বাঙালির জীবনে বিজ্ঞানকে ছড়িয়ে দিয়ে বিজ্ঞান-মনস্ক করে তোলবার দিকে মন দিয়েছিলেন। এই কারণে তাঁর বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধাদি অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে লিখিত হয়—যাতে সাধারণ বাঙালি সে সব রচনাদি পড়ে সচেতন হয়ে ওঠে। রামেন্দ্রসুন্দরের মধ্যে সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শনের এক দুর্লভ সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি দর্শনিকের মতো চিন্তা করেছেন, বৈজ্ঞানিকের বস্তুনিষ্ঠা নিয়ে বক্তব্যকে বিন্যস্ত করেছেন এবং সবার শেষে সাহিত্যিকের রসবোধ দিয়ে তা প্রকাশ করেছেন। বাংলা ভাষায় চার্লস ডারউইনের তত্ত্বকে তিনিই প্রথম বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। ভারতীয় দর্শনের বেদান্তবাদও তাঁর আলোচ্য দিক। ডারউইনের তত্ত্বের সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের মিশ্রণসাধন তাঁর একটি বড়ো অবদান। দুরূহ তত্ত্বের আলোচনা ফাঁকে ফাঁকে অনেক সময়েই সাহিত্য বা প্রাত্যহিক জীবনের

নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে সেটিকে হৃদ্য ও প্রাঞ্জল করে তুলতেন। তাঁর গদ্যও বিশেষত্বপূর্ণ। আলোচ্য 'নিয়মের রাজস্ব' প্রবন্ধটি তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ 'জিজ্ঞাসা' (১৯০৪) থেকে গৃহীত। প্রবন্ধটি একটি সুলিখিত প্রবন্ধ এবং সে কারণেই এটি বহুপঠিত।

৪৪.৩ রামেন্দ্রসুন্দর ঃ জীবনকথা

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর (১২৭১ বঙ্গাব্দ/ইং ১৮৬৪—১৩২৬ বঙ্গাব্দ/ইং ১৯১৯) পূর্বপুরুষ বুন্দেলখণ্ড থেকে বঙ্গাদেশের ফতেপুরে আসেন এবং মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিপুরের কাছে টেঙা বৈদ্যপুর গ্রামে বসবাস শুরু করেন। কর্ম ও বিবাহসূত্রে এঁরা জেমো (কান্দি) রাজবাড়ির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞান বিভাগে অনার্সে প্রথম হন, প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে। ১৮৮৭-তে তিনি বিজ্ঞানে এম.এ. (তখন এম.এস.সি. চালু হয়নি) পাশ করেন। প্রথম স্থান অধিকার করে। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে রামেন্দ্রসুন্দর কলকাতার রিপণ কলেজের (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, পরে ওই কলেজের অধ্যক্ষ হন,—আমৃত্যু সেই পদেই কর্ম করেন। রামেন্দ্রসুন্দরের দ্বিতীয় কর্মক্ষেত্র বলতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, নানাভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও তাঁর সংযোগ দীর্ঘদিনের নানাভাবে। তাঁর দুই কন্যা—চঞ্চলা ও গিরিজা।

রামেন্দ্রসুন্দরকে প্রভাবিত করেছেন একদিকে বঙ্কিমচন্দ্র, অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রবীন্দ্রনাথকে তিনি সাহিত্যের সহযোগীরূপে পান। বি.এ. পড়বার সময়েই 'নবজীবন' পত্রিকায় 'মহাশক্তি' (১২৯১ বঙ্গাব্দ, পৌষ মাসে) তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়, যদিও তা বেনামীতে। তিনি ছিলেন স্বভাষা ও স্বদেশানুরাগী, আদর্শনিষ্ঠ। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ বৃদ্ধি করবার জন্যই তিনি বৈজ্ঞানিক পরিভাষিক শব্দের বঙ্গানুবাদে ব্রতী হন। ভারতের প্রাচীন জীবনাদর্শের প্রতি তাঁর বিশ্বাস একদিকে যেমন তাঁর প্রশংসার কারণ হয়েছে অপরদিকে কেউ কেউ সে বিষয়ে সপ্রশংস হতে পারেনি। 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে' বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর' প্রবন্ধে বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্তদর্শনের সমন্বয়কে প্রশংসা চোখে দেখেননি। নিজে বিজ্ঞানী বলেই সত্যেন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণা আশা কলেছিলেন। আসলে এ বিষয়ে যাঁরা রামেন্দ্রসুন্দরের সমর্থক তাঁরা অন্য কথা বলতেন। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ধারায় রামেন্দ্রসুন্দর কোনো মৌলিক গবেষণা না করে প্রাচীন ভারতীয় বেদান্ত দর্শনেরক আলোকে তিনি বিজ্ঞানের 'ফাঁকি' ধরে ফেলেছিলেন, এতেই তারা উল্লসিত হতেন।

মানুষ হিসেবে শিক্ষক হিসেবে একটি কলেজের প্রশাসক হিসেবে, আদর্শ একজন গৃহীরূপে, স্বদেশসেবক রূপে, রামেন্দ্রসুন্দরের ব্যক্তিত্বের যে প্রমাণ-পরিচয় মেলে, তা খুবই প্রীতিপ্রদ। শিক্ষক হিসেবে ক্লাসে বিজ্ঞান বিষয়টি বাংলা ইংরেজি—দু'ভাষাতেই পড়াতেন। তাঁর শিক্ষকসত্তা তাঁর প্রবন্ধের রচনারীতির মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে যে অতি-কথন দোষ আবিষ্কার করেছিলেন, মনে হয়, শিক্ষকরূপে পাঠকদের বোঝাতে গিয়েই সেটি ঘটেছে।

রাত জেগে পড়া শোনা করতেন তিনি। এর ফলে শীঘ্রই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। যকৃতের পীড়া এবং মস্তিষ্কের রোগে তিনি আক্রান্ত হন। মাতা এবং কনিষ্ঠা কন্যার মৃত্যুশোকে তিনি মানসিক দিকে থেকে বিশেষ আহত হন। মাত্র ৫৫ বছর বয়সেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

৪৪.৪ রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধ সাহিত্য

তাঁর স্বল্পকাল স্থায়ী জীবনে রামসুন্দর বেশি পরিমাণে রচনাদি লিখে যেতে পারেননি। জীবনের শেষ পর্বে তিনি যখন নব্য-ডারউইনবাদ এবং জগতের নিয়মশৃঙ্খলার কঠোরতাকে পরিত্যাগ করে এক দার্শনিক অনুভবের ক্ষেত্রে এসে

পৌঁছেছিলেন, সেই সময়েই তাঁর মৃত্যু হয়। রোগাক্রান্ত হয়ে শেষের দিকে তিনি নিজে আর লিখতে পারতেন না, তাঁর বক্তব্য লিখে নেওয়া হত। তাঁর এই কথন ছিল বিচিত্র প্রসঙ্গকে ঘিরে।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রণীত প্রবন্ধগ্রন্থগুলি এই ঃ 'প্রকৃতি' (১৮৯৬), 'জিজ্ঞাসা' (১৯০৪), 'বঙ্গলক্ষীর ব্রতকথা' (১৯০৬)। 'মায়াপুরী' (১৯১১), 'কর্মকথা' (১৯১৩), 'চরিতকথা' (১৯১৩), 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' (১৯১৪), 'শব্দকথা' (১৯১৭), মৃত্যুর পর প্রকাশিত—'বিচিত্র জগৎ' (১৯২০), 'যজ্ঞকথা' (১৯২০), 'নানাকথা' (১৯২৪), 'জগৎকথা' (১৯২৬)। রামেন্দ্রসুন্দরের অধিকাংশ গ্রন্থের নামে 'কথা' শব্দটি আছে। এটি অকারণে নয়। তাঁর বক্তব্যকে দুরূহ প্রবন্ধের ভঙ্গিতে প্রকাশ না করে পাঠকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ কথা বলার ভঙ্গিতে যেন প্রকাশ করেছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধগুলি বিচার করলেই তাঁর আলোচ্য বিষয়গুলি মোটামুটি জানা যায়। যেহেতু তিনি মূলত বিজ্ঞানের ছাত্র ও অধ্যাপক, সেইহেতু বিশুদ্ধ জ্ঞানের দিক থেকে বিজ্ঞান-শাস্ত্রকে লক্ষ্য করার প্রবৃত্তি তাঁর মধ্যে অধিক পরিমাণে ছিল। জীবনের প্রথম দিকের প্রবন্ধগুলির মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারাকে প্রকাশ করতে উৎসাহী হন। বিভিন্ন বঙ্গীয় সাময়িক পত্রে (যথা ঃ 'প্রদীন', 'জন্মভূমি', 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', 'সাহিত্য ভারতী', 'সাধনা', 'নবপর্যায় বঙ্গ-দর্শন', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'মানসী ও মর্মবাণী') তিনি অক্লান্তভাবে প্রবন্ধ লিখে গেছেন। ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে তাঁকে সবচেয়ে প্রভাবিত করেছিলেন চার্লস ডারউইন। ডারউইনের তত্ত্বকে যাঁরা বিস্তৃত করে তুলে ধরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আছেন—টমাস হেনরি হাক্সলি। হার্বার্ট স্পেনসারের Synthetic Philosophy অর্থাৎ সমন্বয়ী দর্শনের দ্বারাও তিনি প্রভাবিত। এই সমন্বয়মূলক দর্শনকে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শন, হিন্দু ও খ্রিস্টানের ধর্মচিন্তা, কর্ম ও বৈরাগ্যের বিরুদ্ধতার মধ্যে সম্মিলন—ইত্যাদি ক্ষেত্রেও প্রসারিত করে নিয়েছিলেন। 'চরিত কথা' গ্রন্থে জার্মান বৈজ্ঞানিক হেলস হোলৎজ এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরেরক বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী এবং সেগুলির অন্তর্নিহিত চিন্তার মূল্যায়ন করেছেন অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি রিপণ কলেজে রামেন্দ্রসুন্দরের সহকর্মী ছিলেন এবং এঁর সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর নিজের গভীরতম চিন্তাগুলি নিয়ে আলোচনা করতেন রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের কোনো মৌলিক গবেষণা করেননি, তথাপি প্রথমনাথ তাঁকে 'বিজ্ঞানের ঋষি' অ্যাখ্যা দিয়েছিলেন। প্রমথনাথের মন্তব্য ঃ "যাঁহারা সাক্ষাৎভাবে বিজ্ঞানের সৃষ্টি না করিলেও বীজমন্ত্রগুলি যাঁহাদের ধ্যানে যথাযথভাবে আবির্ভূত হয়, তাঁহারা বিজ্ঞানর কবি ; রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের ঋষি ছিলেন, কেন না, তাঁহার ধ্যানে বিজ্ঞান যেমন স্বরূপে ধরা দিয়াছিল, তেমন ধরা বিজ্ঞান সচরাচর দেয় না।" বিজ্ঞানের এই স্বরূপ যাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়বে, তিনিই বিজ্ঞানকে যথার্থভাবে আয়ত্ব করতে পারবেন। বিজ্ঞানের একটি বৈশিষ্ট্য হল, বিজ্ঞান নিয়ত পরিবর্তনশীল। আজ যা নতুন নিয়ম কালকের গবেষণায় তা মিথ্যে বলে প্রায়ই প্রমাণিত হয়। আলোচ্য 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটির মধ্যেও পরোক্ষভাবে একথা বলা হয়েছে। ভারতীয় দর্শনতত্ত্ব একটি স্থায়ী সত্যকে আবিষ্কার করেছিল ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্যা যা পারেনি। এইখানেই বিজ্ঞানবিদ্যা (বা অপরাবিদ্যা)-র ওপর পরবিদ্যা বা দর্শনের জিত। রামেন্দ্রসুন্দর শেষপর্যন্ত তাই বিজ্ঞানের ওপর দর্শনকে স্থান দিয়েছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম গ্রন্থ 'প্রকৃতি'তে তিনি বিজ্ঞানের জগৎকেই মূলত প্রাধান্য দিয়েছেন। তারপর 'জিজ্ঞাসা', 'কর্মকথা' প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে তাঁর দার্শনিক চিন্তার ক্রমিক উন্মেষ ঘটতে থাকে। 'বিচিত্র জগৎ' (১৯২০) বইতে তিনি বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনকে সমন্বিত করবার চেষ্টা করেছেন। এইভাবে তাঁর চিন্তার মধ্যে আমরা একটি বিবর্তন দেখতে পাই।

বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দরের যে style বা শৈলীটি তা সাহিত্যের দিক থেকে আজও তাঁকে বিশিষ্ট করে রেখেছে। দুরূহ বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক তত্ত্বকে তিনি দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং নানা ধরনের সাহিত্য থেকে আহৃত রূপ-উপমা-উদাহরণ দিয়ে পরিস্ফুট করতেন। এতে যেন এক ধরনের কথা শিল্পী সুলভ ভঙ্গি তাঁর রচনার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠত। রামায়ণ-মহাভারত, ঈশপের গল্প, কালিদাসের সাহিত্য (আলোচ্য

'নিয়মের রাজত্বে', 'কুমারসম্ভব' থেকে একটি প্রসঙ্গকে উদাহরণরূপে তিনি গ্রহণ করেছেন।) বঙ্কিমসাহিত্য (কখনো রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রত্যক্ষ কিংবা তির্যক উল্লেখ), বিবিধ অভারতীয় সাহিত্য, এবং এমনকি সমকালীন নানা ঘটনার উল্লেখ করে তিনি তাঁর বক্তব্যকে পাঠকের কাছে হৃদ্য ও মনোরম করে তুলতেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক William Kingdom Clifford (১৮৪৫-১৮৭৯) ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়বার সময় একটি উদ্ভট ছোটগল্প লিখেছিলেন। 'প্রকৃতি' গ্রন্থের অন্তর্গত 'প্রকৃতির মূর্তি' প্রবন্ধে কিংবা 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের অন্তর্গত 'অতিপ্রাকৃত-প্রথম প্রস্তাব' প্রবন্ধে ক্লিফোর্ড-এর সেই গল্পের প্রাসঙ্গিক অংশটির উল্লেখ করে আপন রচনার সুখপাঠ্যতা বৃদ্ধি করেছেন, যদিও ক্লিফোর্ড-এর নাম সেখানে করেননি। রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্য খুব সচল এবং কৌতুকদীপ্ত ছিল।

৪৪.৫ মূলপাঠ (প্রথম অংশ)

বিশ্বজগৎ নিয়মের রাজ্য, এইরূপ একটা বাক্য আজকাল সর্বদাই শুনিতে পাওয়া যায় ..... দূরের তারাগুলি পরস্পর হইতে এতদূরেআছে যে, পরস্পর আকর্ষণ থাকিলেও তাহার ফল এত সামান্য যে, তাহা আমাদের গণনাতেও আসে না, আমাদের প্রত্যক্ষ গোচরও হয় না।

৪৪.৬ সারাংশ

পার্থিব জগতে বা সৌরলোকে, অর্থাৎ প্রাকৃতিক জগতের কোথাও কোন প্রকার অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা নেই। সর্বত্রই নিয়ম। নিয়মের রাজত্ব সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত। এই নিয়মের মূল কারণ—বস্তু ও পদার্থের 'আকর্ষণ' এবং 'চাপ'। আকর্ষণ এবং চাপ-এর নিয়মটিকে তিনটি ধারায় ব্যক্ত করা যায়। প্রথমত, পার্থিব আকর্ষণে রপ্ত মাত্রই নিম্নগামী হয়। এই নিয়মের নাম 'ভৌম আকর্ষণ' বা 'মাধ্যাকর্ষণ'। দ্বিতীয়ত, তরল ও বায়বীয় পদার্থের চাপে বস্তু মাত্রই ঊর্ধ্বগামী হয়। তরল পদার্থ বলতে যেমন—জল, তেল বা পারদ। এইখানে বস্তু বা দ্রব্যের লঘু-গুরুর তারতম্যের দিকটি আছে। এক দ্রব্য অন্য দ্রব্যের চেয়ে গুরু কি লঘু, তা দুটি সমান আয়তনের দ্রব্য নিয়ে ওজন করে দেখতে হবে। যেটি ওজনে গুরু, সেটি তরল বা বায়বীয় পদার্থে নিম্নগামী হবে ; আর যদি লঘু হয়, তবে উর্ধ্বগামী হবে। তৃতীয়ত, আকর্ষণ ও চাপ একই সঙ্গে কাজ করে ; আকর্ষণ প্রবল হলে বস্তুকে নামায় ; চাপ প্রবল হলে বস্তুকে ওপরের দিকে তোলে। সেখানে আকর্ষণ ও চাপ সমান, বস্তু সেখানে স্থির থাকে।

এই নিয়ম কেবল পার্থিব জগতের পদার্থের ক্ষেত্রেই ঘাটে না। স্যার আইজ্যাক নিউটন প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন—সৌরজগৎও এ নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও চালিত ; আকর্ষণ এখানেও কাজ করছে। পৃথিবীর আকর্ষণে সৌরজগতের চন্দ্র-সূর্য পৃথিবীর দিকে আসতে চাইছে। পৃথিবীও আবার, সেই আকর্ষণের কারণেই চন্দ্র-সূর্যের দিকে যেতে চাইছে। ফলত, সব গ্রহ-উপগ্রহই অপর গ্রহ-উপগ্রহের দিকে ধাবমান। তারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট বটে, তবে তার পেছনেও সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। এ হল, বিশ্বজগতের এক 'মহা-নিয়ম'। অঙ্গ কষে আগের থেকেই বলে দেওয়া যায়, কবে, কোনদিন কখন, কোন্ গ্রহ বা উপগ্রহ তার কক্ষ-পথের কোথায় অবস্থান করবে। সৌরজগতে যখন এই রকম নির্দিষ্ট নিয়মের আবর্তন বর্তমান তখন অনুমান করা যায়, সৌরজগতের বাইরেও যে জগৎ আছে, সেখানেও এই ধরনের কোন নিয়ম অনুসৃত হয়। তবে প্রবন্ধ রচনাকালীন সময় পর্যন্ত সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।

৪৪.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

প্রবন্ধের প্রথম অংশের উপস্থাপন রীতিটি খুবই হৃদ্য এবং মনোহর। লেখক এক কাল্পনিক প্রতিপক্ষকে সম্মুখে রেখেছেন। সেই কাল্পনিক প্রতিপক্ষ যেন একটার পর একটা প্রশ্ন করছেন আর লেখক তার উত্তর দিয়ে গেছেন।

এইভাবেই প্রবন্ধটির কায়া নির্মিত হয়েছে। যেন একটা প্রশ্ন-উত্তরের ভঙ্গি, যা কথোপকথনেরই প্রসারিত একটি দিক। কাল্পনিক প্রতিপক্ষের প্রশ্নগুলি একটা বিশেষ লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখে করা হয়েছে। তার একটি ক্রমও অনুসরণ করা হয়েছে। এক একটি প্রসঙ্গ আসছে, সে প্রসঙ্গে প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে এবং পরবর্তী সূক্ষ্ম স্তরের প্রশ্ন আসছে এইভাবে সরল থেকে জটিল দিকে, স্থূল থেকে সূক্ষ্ম দিকে প্রসঙ্গের প্রবর্তন ঘটেছে। এর ফলে একটি বিশেষতত্ত্বকে সাধারণ পাঠকের পক্ষে আন্তরে ধারণ করা সহজতর হয়েছে। ইচ্ছে কলেই লেখক এখানে এই Style বা শৈলীটি গ্রহণ করেছেন।

প্রবন্ধটির রচনাগত অপর বিশেষত্ব হল সমগ্র রচনাটির মধ্যে আইনের রূপক গ্রহণ করা। যেহেতু প্রবন্ধটির নামের মধ্যে 'রাজত্ব' কথাটি আছে, সেই জন্য সেই রাজত্বের আইন-শৃঙ্খলা-নিয়ম অনুসরণের দিকেও আছে। এইজন্য প্রবন্ধটিতে আইন প্রণয়ন, আইন প্রবর্তন মান্য করে চলা—এইসব দিকগুলির রূপকময় উল্লেখ আগাগোড়া লক্ষ্য করা যায়।

প্রবন্ধটির রচনাগত তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, লৌকিক ও প্রাত্যহিক জগৎ থেকে অতি পরিচিত দৃষ্টান্তমালা প্রয়োগ করে বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করা। আপরদিকে তেমনি সেই দৃষ্টান্তগুলিকে লঘু হাস্যরসাত্মক করে তোলা। এতে পাঠকের সঙ্গে একটি Intimacy বা অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধটি থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

ক. ঈষৎ ব্যঙ্গাত্মক, তির্যক উক্তি ঃ "কাজেই প্রাকৃতিক নিয়মের জয়গান করিতে গিয়া অনেকে পুলকিত হন, ভাবাবেশে গদগদ কণ্ঠ হইয়া থাকেন ; তাঁহাদের দেহে বিবিধ সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয়।"

খ. রসিকতা ঃ "যে দিন লোষ্ট্রপতিত আম্র ভূপৃষ্ঠ অন্বেষণ না করিয়া আকাশমার্গে ধাবিত হইবে, সেই ভয়াবহ দিন মানুষ্যের ইতিহাসে বিলম্বিত হউক।"

গ. কারো গাছের নারিকেল বৃন্তচ্যুত হয়ে 'বেলুনে'র মতো আকাশে উঠতে দেখলে তাকে বলা হবে—সে 'মিথ্যাবাদী' বা পাগল বা বলবে 'লোকটা গুলি খায়' যিনি রাসয়ন শাস্ত্র পড়েছেন তিনি হয়তো বললেন ঃ "হইতেও বা পারে, বুঝি ঐ নারিকেলটার ভিতরে জলের পরিবর্তে হাইড্রোজেন গ্যাস ছিল।"

ঘ. "আরে মূর্খ, গুরু লঘু শব্দের অর্থ বুঝলে না। গুরু মানে এখানে পাঠশালার গুরুমহাশয় নহে বা মন্ত্রদাতা গুরুরও নহে ; গুরু অর্থে অমুক পদার্থ অপেক্ষা গুরু অর্থাৎ ভারী।" 'গুরু' শব্দটি নিয়ে এখানে Pan বা ঘমক সৃষ্টি করা হয়েছে।

ঙ. "রাম প্রথম দ্রব্য, শ্যাম দ্বিতীয় দ্রব্য। রামকে শ্যামের আয়তন মতে ছাঁটিয়া লইয়া তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দেখ, রাম যদি শ্যাম অপেক্ষা গুরু হয়, তাহা হইলে শ্যামের মধ্যে রামকেক রাখিলে রাম নিম্নগামী হইবে। শ্যামকে তরল পদার্থ মনে করিতে আপত্তি করিও না।" এখানে ব্যক্তিকে পদার্থ রূপে কল্পনার মধ্যে রসিকতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

চ. "যেখানে চাপ আকর্ষম অপেক্ষা প্রবল, সেখানে মোটের উপর উঠিতে হয়। যেখানে উভয়ই সমান, সেখানে "ন যযৌ ন তস্থৌ"। এখানে প্রসঙ্গটি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' বাক্য থেকে গৃহীত। উমা তপস্যারতা ছিলেন, হঠাৎ মহেশ্বর তাঁর সম্মুখে আবির্ভুত। উমা অগ্রসর হতেও পারছিলেন না, পেছতেও পারছিলেন না। একই স্থানে স্থির থাকলেন। উমার অবস্থাটি সমান আকর্ষণ ও চাপযুক্ত কোনো পদার্থের মতো।

কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর রচনারীতির বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করা হল। এই রকম উদাহরণ আলোচ্য অংশেই আরো আছে। বিশেষ করে আইজ্যাক নিউটন কর্তৃক প্রকৃতিকে 'মাতৃ' সম্বোধন করে উক্তিটি। কিংবা শনি, নেপচুন বা ইউরেনাস-এর প্রসঙ্গে লেখকের সকৌতুক মন্তব্য।

বিষয়বস্তুর বিন্যাসের দিক থেকে আলোচন্য অংশটির বিশেষত্ব হল, লেখত তাঁর বক্তব্যকে দুটি স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। প্রথম স্তরে আছে পার্থিব বস্তুর চাপ ও আকর্ষণের প্রসঙ্গ। আর দ্বিতীয় স্তরে আছে অপার্থিব ও

সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ। এইভাবে দুটি স্তরে বক্তব্যকে বিন্যস্ত করবার ফলে পাঠকের কাছে বিষয়টিও সহজবোধ্য হয়ে উঠতে পেরেছে। সৌরজগৎও যে একটা নিয়মের অধীন লেখক তার নাম দিয়েছেন—মহানিময়'। এটি তাঁর নিজের সৃষ্ট শব্দ,—এ ধরনের শব্দের সৃষ্টি ও ব্যবহারও রচনার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

লেখক পাঠককে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে তাঁর বক্তব্যের দিকে নিয়ে গেছেন। এ জন্যই তিনি বিশেষভাবে প্রবন্ধটির কায়া বিন্যাস করেছেন এবং পাঠকের সঙ্গে communication সৃষ্টির জন্য প্রশ্ন উত্তরের উপস্থাপন রীতিটি গ্রহণ করেছেন।

৪৪.৮ অনুশীলনী - ১

ক. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন ঃ

১। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণা অপেক্ষা বিজ্ঞানের কোন্ দিকটিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন ?
২। রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাগুলি কেন অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে লিখিত হয়েছে ?
৩। তিনি ভারতীয় দর্শনের কোন্ দিকটিকে ডারউইনের তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চেলেছিলেন ?
৪। 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটি তাঁর কোন্ প্রবন্ধ-গ্রন্থ থেকে গৃহীত ?
৫। রামেন্দ্রসুন্দরের মূল কর্মক্ষেত্র দুটির নাম বলুন।
৬। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনার নাম কী ?
৭। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-চর্চার বিষয়ে কী মন্তব্য করেছেন ?
৮। রামেন্দ্রসুন্দরের শিক্ষক-সত্তা তাঁর প্রাবন্ধিক-সত্তার মধ্যে কিভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল ?
৯। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধ-গ্রন্থগুলির নাম করুন।
১০। রামেন্দ্রসুন্দরকে কেন 'বঙ্গের হাক্সলি' বলা হত ?

খ. নীচের প্রশ্নগুলির বিশদ উত্তর দিন ঃ

১। রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাদির মূল্যায়ন করুন।
২। রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাদির উপস্থাপন ও গদ্যরীতি প্রসঙ্গে আলোচনা করুন।
৩। বিজ্ঞান থেকে দর্শনের ক্ষেত্রে রামেন্দ্রমানসের বিবর্তনের ধারাটি তুলে ধরুন।
৪। বস্তুর 'আকর্ষণ' ও 'চাপে'র যে নিয়মগুলির কথা এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে, সেগুলির উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করুন।
৫। 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটির এই অংশে বিন্যাসের যে দুটি স্তর দেখা যায়, সে বিষয়ে মন্তব্য করুন।

৪৪.৯ মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ)

সম্ভবত এই আইনের এলাকা বহুদূর বিস্তৃত "..... বৌদ্ধ একেবারে চুকাইয়া দেন ও বলেন, কিছুই ঘটে নাই।"

৪৪.১০ সারাংশ

আইজাক নিউটন আবিষ্কৃত বিশ্বজগৎব্যাপী যে এক 'মহানিয়মের' কথা প্রবন্ধের প্রথম অংশে বলা হয়েছে, প্রবন্ধের এই দ্বিতীয় অংশে সেই মহা-নিয়মের ব্যভিচার-ব্যতিক্রম সম্পর্কে লেখক আরো নতুন কথা বলেছেন। লেখকের প্রথম বক্তব্য ঃ সেই 'মহানিয়ম' যদি সর্বত্র নাও খাটে, তবু বলতে হবে, সেখানেও কোন না কোন নিয়মের অস্তিত্বও বন্ধ আছেই। কারণ, নিয়ম ছাড়া বিশ্ব জগতে কোন ঘটনাই কাদাপি ঘটতে পারে না। তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্য ঃ কোন ঘটনাকে সাবেক নিয়মের ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম বলে প্রাথমিকভাবে আমাদের মনে হতে পারে ; কিন্তু সত্য

নয়। আসল সত্য হল ঃ আমাদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের অভাবে, যাকে সাবেক নিয়মের ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম বলে চিহ্নিত করেছি,—তা সেই প্রদেশেরই একটি নিয়ম,—সে কথা ভেবে দেখি না। কাজেই তা একটা 'নবাবিষ্কৃত অজ্ঞাতপূর্ব নিয়ম'—অভিজ্ঞতার অভাবে যা আমাদের জানা ছিল না। সেখানকার সেই 'অজ্ঞাতপূর্ব নিয়মটি' জানার ফলে আর সেগুলিকে পরিচিত নিয়মের ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম বলে মনে হবে না। সেখরে তৃতীয় বক্তব্য হল এই ঃ বিশ্বজগতে যা কিছুই ঘটে, তাই-ই কোন নিয়মের বশে ঘটে ; প্রতিটি ঘটনারই একটি 'সম্বন্ধ' বা শৃঙ্খলা থাকে বা আছে। আমাদের অভিজ্ঞতাবৃদ্ধি এবং পর্যবেক্ষণের ফলে, ক্রমে ক্রমে, সেই 'সম্বন্ধ' বা শৃঙ্খলাটিকে আর কোন বে-নিয়মের ফল বলে মনে হয় না। যতদিন সেই 'সম্বন্ধ' বা শৃঙ্খলাটিকে আবিষ্কার করতে না পারি, কেবল ততদিনই ওই বিশেষ ঘটনা বা ঘটনা-ধারাকে মূল নিয়মের ব্যতিক্রম বলে ভুল করি। লেখক তাঁর প্রবন্ধ এই বলে শেষ করেছেন ঃ বিশ্বজগতের সর্বত্রই নিয়মের বন্ধনকে দেখে আমাদের বিস্মিত বা আনন্দিত হবার কোন কারণ নেই। বরং এটাই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, সর্বত্রই এবং সর্বদাই কোন না কোন ঘটনা নিরন্তর ঘটেই চলেছে কিন্তু সেই সব ঘটনা যে ঘটে চলেছে, কী তার প্রয়োজন কেউ তা জানে না। নানা ধরনের মানুষ তার নানা উত্তর দেন।

৪৪.১১ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটির দ্বিতীয় অংশটির তুলনায় প্রথম অংশটিতে বক্তব্য যতখানি বিশদ ও বিস্তৃত, সেই কারণেই তা প্রাঞ্জল এবং সুখপাঠ্য। দ্বিতীয় অংশটিতে বক্তব্য জটিলতর, কিন্তু তা উপযুক্ত পরিমাণে বিস্তৃত করা হয়নি। এই অংশের একেবারে শেষে যে মন্তব্য করা হয়েছে, সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাক দুরূহ।

এই দ্বিতীয়াংশে পর-পর কেবলই ব্যতিক্রমাত্মক দৃষ্টান্ত স্থাপন এবং সেগুলির যুক্তিগ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দেশ করা হয়েছে। সেটি ঘটেছে একটি বিশেষ পথ ধরে। প্রথমে তাঁর মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক দিকটি কার্যকরী হয়েছে, তার কথা বলি। লেখক জগদ্ব্যাপী নিয়মকে দেখেছেন—দুটি দিক থেকে। একদিকে তিনি বিশ্বচরাচর ব্যাপী একটি কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী ; অপরদিকে বিশ্বচরাচর ব্যাপী নিয়ম-শৃঙ্খলার আবিষ্কারের নিরন্তরতায় বিশ্বাসী। একটি নিয়ম এখন পর্যন্ত স্থির, অপর নিয়ম নিরন্তর আবিষ্কৃত দিক। বর্তমানের দৃষ্ট সত্য ও নিয়ম এবং ভবিষ্যতের অ-দৃষ্ট অনাগত অনাবিষ্কৃত নিয়ম—দুই নিয়মেই তিনি সমপরিমাণে বিশ্বাসী। ফলে তাঁর বিজ্ঞানবাদী দৃষ্টি ও মন একটি আধুনিক সচল দৃষ্টিকে আয়ত্ত করেছে।

নিয়মের এই নিরন্তরতায় এবং নতুন নতুন নিয়মের আবিষ্কারের বিশ্বাস স্থাপন একটি সচল মনের পরিপোষক এবং এত এক ধরনের দার্শনিকতা বটে। কিন্তু এইখানেই বিজ্ঞানের সত্যের সঙ্গে দার্শনিকের সত্যের একটি বিরোধও রামেন্দ্রসুন্দর লক্ষ্য করেছিলেন। বৈজ্ঞানিকের সত্য স্থির-স্থায়ী-ধ্রুব সত্য নয়। আজ যা সত্য, কাল তা অন্য সত্য আবিষ্কারের ফলে নাকচ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু দার্শনিকের সত্য স্থির-ধ্রুব সত্য। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের সত্যের চাইতে দার্শনিকের সত্যের ওপরেই পরবর্তীকলে অধিকতর গুরুত্ব ন্যস্ত করেছেন।

তবে, বৈজ্ঞানিকের এই সত্যের নিরন্তররতা বা ক্রমে ক্রমেই নবতর আবিষ্কারের পলে পূর্ববর্তী সত্যের খারিজ হয়ে যাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরো একটি কথাও বলেছেন ঃ জগদ্ব্যাপারে এই যে নিরন্তরতা ক্রমে-ক্রমেই ঘটনাবলি কেবলই ঘটে চলেছে, তার কারণও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর যে কথা বলেছেন,—তাও একটি দার্শনিক মন-প্রসূত। তিনি বলেছেন ঃ "জগতে কিছু-না কিছু ঘটিতেছে, এটার পর ওটা ঘটিতেছে, যাহা যেরূপে ঘটিতেছে তাহাই নিয়ম, প্রাকৃতিক নিয়মেরআর কোন তাৎপর্য নাই। এই নিয়ম দেখিয়া বিস্ময়ের কোন হেতু নাই।.... একটা কিছু যে ঘটিতেছে ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।" লেখকেরক এই উক্তিটিই একটি দার্শনিক উক্তি।

তাঁর উত্থাপিত শেষ প্রশঙ্গাটি হল ঃ "জগৎ ঘটনাটার প্রয়োজন কি ছিল, ইহা ঘটেই বা কেন..." তার উত্তর অন্বেষণ করা। সেই উত্তর অন্বেষণ করতে গিয়ে তিনি নানা স্তরের নানা ধরনের মানুষের কাল্পনিক উত্তর প্রদান

করেছেন, এবং তারই মধ্যে চিন্তাধারার বিস্তৃতি ধরা পড়েছে। প্রথমত, 'অজ্ঞানবাদী'র 'অজ্ঞতাবাদ (Agnosticism), যে তত্ত্বের মূল কথা হল—জগতের চরমতত্ত্ব চিরকাল অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় থাকে। কাজের উল্লিখিত নিয়ম সম্পর্কে প্রত্যাশিতভাবেই তাঁরা বলবেন—'জানি না'। বৈদান্তিকেরা অদ্বৈতবাদী, অর্থাৎ জীবন ও ব্রহ্ম অভিন্ন, একাত্ম। কাজেই ব্রহ্মই এই সব ঘটাচ্ছেন, অর্থাৎ 'আমি'ই যেন তা ঘটাচ্ছি। বৈদান্তিকের উত্তর তাই ঃ "আমিই সেই অঘটন-ঘটনায় পটু।" বৌদ্ধদের নাস্তিক্যবাদের কারণেই লেখক সেই অনুযায়ী জগদ্ব্যাপী নিয়মের ব্যাখ্যা তাঁদের মুখে দিয়েছেন।

আলোচ্য অংশটির রচনারীতি প্রথম অংশটিরই মতো। এখানেও সেই অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে লেখক পাঠকের সঙ্গে একটি সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়েছেন। তারপর যেন তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন, ফলে একটি কথোপকথনের ভঙ্গি তাতে ফুটে উঠেছে। যেমন,

"চুম্বকের কাঁটা চিরকালই এক মুখে থাকিবে, এমনকি কথা আছে ? উহা একটু একটু করিয়া প্রতি বৎসর সরিয়া যায়,...উহাই ত নিয়ম। কাঁটা আবার থাকিয়া থাকিয়া নাচে, কাঁপে, স্পন্দিত হয়। ঠিকই ত, সময়ে সময়ে নাচাইতে নিয়ম। প্রতি এগারো বৎসরে একবার উহার এইরূপ নর্তনপ্রবৃত্তি বাড়িয়া উঠে।" এখানে বাক্য ভঙ্গিতে অব্যয় 'ত' এর প্রয়োগ একটি সহজ স্নিগ্ধতার সৃষ্টি করেছে। তেমনি, চুম্বকের কাঁটার 'নর্তনপ্রবৃত্তি'র উল্লেখ মৃদু রসিকতার প্রবর্তন করেছে।

কিংবা আর একটি দৃষ্টান্তে—এখানে পাঠককে সরাসরি সম্বোধন করে বক্তব্য বলা হয়েছে।

"তুমি সোজা চলতেছ, ভাল, উহাই নিয়ম ; বাঁকা চলিতেছ, বেশ কথা, উহাই নিময়, তুমি হাসিতেছ, ঠিক নিয়মানুযায়ী, কাঁদিতেছে, তাহাতেও নিয়মের ব্যতিক্রম নাই।"

এই প্রসঙ্গে একটি তথ্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। বাংলা সাহিত্যে যাঁরাই বিজ্ঞানচর্চা করেছেন (যেমন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু) তাঁরাই অতি সহজ, কৌতুক-স্নিগ্ধ সরস গদ্যে তা করেছেন। রামেন্দসুন্দর সেই ধারারই সাধক। ইংরেজি Popular science এর সঙ্গে তুলনীয়।

৪৪.১২ অনুশীলনী - ২

ক নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন ঃ

১। 'মহানিয়ম' বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন ?

২। প্রত্যেক ঘটনার 'সম্বন্ধ' ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য কী ?

৩। বিশ্বজগতের সর্বত্রই নিয়মের অস্তিত্ব দেখে আমরা কি বিস্মিত বা আনন্দিত হব ?

খ. নীচের প্রশ্নগুলির বিশদ উত্তর দিন ঃ

১। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে সমন্বয় কিভাবে ঘটেছে ?

২। বিশ্বব্যাপী নিয়মের কারণরূপে বিভিন্ন স্তরের মানুষের বক্তব্য কী ?

৩। আলোচ্য অংশটির গদ্যশৈলী সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

৪৪.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

(১) অধীর দে — আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা।

(২) নির্মলেন্দু ভৌমিক — রামেন্দ্র রচনা সঞ্চয়ন (ভূমিকা)।

(৩) সুকুমার সেন — বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য।